হস্তীকন্যার কাহিনী ও মাহুতের গান

গৌরীপুরের লোকসংগীত সম্পর্কে আলোচনা

নীহার বড়ুয়া

যে অঞ্চলের লোকসংগীতের একটি অংশকে নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা, সেই অঞ্চলটি আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি আসামের অন্তর্ভুক্ত হলেও ওখানকার ভাষাকে অসমীয়া ভাষা বলা চলে না। শতবর্ষপূর্বে এটি উত্তরবঙ্গেরই অংশ ছিল। বর্তমানে আসামের অন্তর্ভূক্ত হলেও এখানকার ভাষা বা সংস্কৃতির এতকাল কোনো উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেনি। রংপুর ও কুচবিহারের সীমানায় অবস্থিত এই অঞ্চলটির কৃষ্টি, আচার - ব্যবহার, ভাষা এবং তার উচ্চারণ - ভঙ্গি ও উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিরই প্রায় অনুরূপ। এই ভাষাকে কোচ - রাজবংশী ভাষা বলে বর্তমানে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য 'বাহে' ভাষা বলেও এর একটি ব্যাঙ্গোক্ত পরিচয় আছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ করে পূর্ববাংলার বহু ধনী ও ভদ্রপরিবার বহুকাল যাবৎ জমিদার রূপে কিম্বা ব্যবসায় সূত্রে উত্তরবঙ্গে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছেন। তাঁরা নিজেদের এখন উত্তরবঙ্গবাসী বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষা বা কৃষ্টি ঐ সমাজে অপ্রচলিতই রয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথ্য ভাষা পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার মিলিতরূপ নিয়ে অন্য একটি রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁরাই স্থানীয় আদিবাসীর ভাষা এবং লোকদেরও — পূর্ববঙ্গ বাসীদের (হয়তো ব্যঙ্গ করেই) যেমন 'বাঙাল', পশ্চিমবঙ্গবাসীদের 'ঘটি' বলা হয়, তেমনি এঁদের 'বাহে' বলে উল্লেখ করে থাকেন। তা থেকেই মনে হয় এই 'বাহে'র উৎপত্তি। 'বাহে' অর্থাৎ 'বাবা-হে'। সম্বোধনকালে যেমন পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে 'ওগো' বা 'ওহে' বলা হয়, উত্তরবঙ্গে গ্রাম্যকথায় 'বাহে' বলাই ভদ্রতা এবং সম্মানসূচকও বটে। তাঁদেরই কথা, তাঁদেরই গান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

অবশ্য এই অঞ্চলের ঐতিহ্যের দিকটা কালের প্রবাহে নানারূপ আবর্তন - বিবর্তনে গুণী সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের কিছুটা দৃষ্টি এদিকে পড়লেও, এখনও এই অঞ্চলটির বিপুল সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, আসামের কিংবা বাংলাদেশের বিদগ্ধ জনের কাছে। আর তার প্রধান কারণ সম্ভবত ঐ আঞ্চলিক ভাষা।

তবে এসব আজকের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত নয়। আজ ওখানকার স্থানীয় কিছু লোকের কর্মজীবনকে ঘিরে যে লোকসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে তারই কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতো আসামেও বিভিন্ন স্থানে এবং এই গোয়ালপাড়ার তরাই অঞ্চলেও হাতি ধরা হয়। স্থানীয় কিছু লোক এই হাতি ধরার এবং তাদের পোষা মানানো ও পরিচালনার কাজকে জীবিকার জন্য গ্রহণ করে থাকেন। আজ তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে।

ঐ অঞ্চলের বুনো হাতিদের শিক্ষা দেওয়ার অর্থাৎ পোষ মানানোর সময় গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত। তার মধ্যে আবার কতগুলি বিশেষ ধরনের 'লোকগীতি' স্থান পেয়েছে— এবং তারই একটি গানে হাতিদের ব্রাহ্মণ - বংশজাত বলে সম্বোধন করায়, কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে— প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ঐ জেলার গৌরীপুরে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার 'পিলখানা'র অর্থাৎ হস্তীশালার সর্দার, বৃদ্ধ যাদু জামাদারকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তখন তিনি এর মূলে যে কিংবদন্তি (Legend) চলে আসছে — সেই কাহিনীটি বলে শোনান। তাঁর কাছে শুনে কাহিনীটি স্থানীয় ভাষায় লিখে রেখেছিলেন। কারণ তার বর্ণনা এবং গল্প বলার ধরনটি প্রকৃতই অপরূপ ছিল। কাগজে - কলমে অবশ্য তার সেই রূপটিকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কেবল কাঠামোটিই থেকে গিয়েছে। এখানে বাংলাভাষায় সেই কাহিনীটির সারাংশ দিয়ে আজকের প্রবন্ধ শুরু হচ্ছে।

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসেছে গভীর অরণ্যের বুক চিরে ''দ্যাঁওয়া - সিয়া নদী''। অর্থাৎ 'দৈবী মায়াময়ী নদী'। কারণ সেই তীব্র স্রোতস্বিনীর জল আসতে আসতে হঠাৎ পাতাল পথে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার কিছুদূরে গিয়ে কলকল রবে কঠিন শিলার আস্তরণ ভেদ করে তীরবেগে ছুটে চলে।

তারই তীরে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে জয়নাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ও তার অপরূপ সুন্দরী ঘরণী জয়মালার আস্তানা। জয়নাথ যজমানি করে, জয়মালা চরকায় 'রকম - বেরকমের' সুন্দর সুন্দর বৈতা কাটে। সেই পৈতা আশেপাশের সাতগাঁয়ের ব্রাহ্মণরা পড়তে দেয় না, কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়। এতেই তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। খেয়ে নিয়ে যেটুকু বাঁচে— নদীর ধারে গিয়ে তা ছড়িয়ে দেয়, বনের পশুপাখিদের ভোজ শুরু হয়ে যায়। তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে বনের মধু, সুমিষ্ট ফল - মূল, শাক - পাতা জয়মালার উপহার মেলে। স্বামীর সোহাগ ও বন্য প্রাণীদের সাহচর্যে নিবিড় আনন্দেই জয়মালার দিন কাটছিল। হেনকালে পার্শ্ববর্তী গ্রামের হঠাৎ এক বিত্তবান ব্রাহ্মণের কেবল একটি মাত্রই কন্যা। কন্যাটি একে রূপহীনা, তায় অতি আদরে অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও অকর্মণ্য। তাই আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্তেও মেয়েটির বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। জয়নাথকে গরীব জেনে তার সুযোগ নিয়ে মেয়েটির বিধবা মা, এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যাটিকে গ্রহণ করে তাঁকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করবার জন্য ধরে পড়েন। প্রথমে জয়মালার কথা স্মরণ করে আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত জয়নাথ সম্পত্তির লোভ সম্বরণ করতে পারে না। নিয় যায় বিত্তবতী গরবিনীকে বিয়ে করে। জয়মালা অবাক হয়ে দেখে, তার কুঁড়ে ঘরটিতে আশ্রয় নেয়।

তারই পাশে দেখতে দেখতে 'তে -মহলা' বাড়ি ওঠে। দাসী, চাকর, পাইক, বরকন্দাজে সরগরম। জয়মালা কুঁড়ে ঘর থেকেই সপত্নী ও স্বামীর ঐশ্বর্য ও প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করে। নবপরিণীতা পত্নীর অনুশাসনে জয়মালার সঙ্গে জয়নাথের বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়। জয়মালা নিযুক্ত হয় নদী থেকে জল বয়ে আনার কাজে। দুঃখের মধ্যে সেটাই হয় জয়লামার বেঁচে থাকার অবলম্বন। ধনী স্বামীর 'সোনার ঝারি'তে জল ভরে ঘরে রাখতে গিয়ে তবুও মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময় ঘটে পতিদেবতার সঙ্গে। সেইটুকুই একমাত্র স্বামীর সঙ্গে যোগসূত্র। এই কাজের বিনিময়ে দাসীরা দিন শেষে একখানা পেতলের থালায় একথালা 'আঁকাড়া' মোটা চালের ভাত রেখে যায়। জয়নাথ দ্বিতীয়া পত্নীকে নিয়ে আসার পর থেকেই জয়মালা বনের ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করে, সপত্নীর কদন্ন মুখে তোলে না। এক হাতে সেই ভাতের থালা, অন্য হাতে 'সোনার ঝারি' এবং মাথায় একটি তামার কলসী নিয়ে বনপথে নদীর দিকে বেরিয়ে যায়। পথে পথে সেই ভাত পশু - পাখিদের বিলিয়ে দিয়ে যখন ঘাটে গিয়ে বসে—তখন দুই চোখের ধারা বুক বেয়ে নদীতে গিয়ে মেশে।

এখন সেই নদীতে ঐ ঘাটের উজানে 'হস্তীরাজা' দলবল নিয়ে প্রায় জল খেতে আসত এবং জল খেলা করত। একদিন খেলার সময় ভাসতে ভাসতে জয়মালার ঘাটের ভাটিতে গিয়ে উপস্থিত। 'হস্তীরাজা' সেই জল মুখে দিয়ে দেখে - জল অত্যন্ত লোনা ও বিস্বাদ। তখন 'হস্তীরাজা' সঙ্গী সাথীদের প্রশ্ন করে , ''উজানের জল এতো মিষ্টি, ভাটির জল এতো বিস্বাদ কেন?'' তার উত্তরে সাঙ্গোপাঙ্গরা বলে, ''মহারাজ , এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা এই সময় রোজ সে জলের ঘাটে বসে 'দুই নয়নে'র জল ছেড়ে দেয়। সেই জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে বাটির জলের এই অবস্থা।'' তখন হস্তীরাজ কালবিলম্ব না করে কন্যার সান্নিধ্যে গিয়ে দেখে— সেই কন্যাটি মাথায় একটি 'তামার

কলস' ও হাতে একটি 'সোনার ঝারি' নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছে। হস্তীরাজা তখন পথরোধ করে দাঁড়িয়ে তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে সমস্ত বিবরণ জেনে নেয়। তারপর এই নিষ্ঠুর মানবসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে, তাদের রাণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। তখন জয়মালার মনে দ্বিধার উদয় হয়। কিন্তু চিন্তা করার সময় মেলে না। মেঘের গর্জনের মতো শব্দ করতে করতে সেই 'দ্যাঁওয়া - সিয়া' নদীর বুকে 'ঢল' নেমে আসে। দেখতে দেখতে দুইকুল ছাপিয়ে সেই বিপুল জলরাশির তোড় —জয়মালার কুঁড়ে ঘরটি, নবনির্মিত 'তে -মহাল বাড়ি,' এবং আশেপাশের সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। জয়মালার আতঙ্গে বাক্যলোপ হয়ে যায়। তখন সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্রগতিতে হস্তীরাজা জয়মালাকে মাথায় তুলে নেয়। তারপর অপরূপ বিচিত্র ফুলেফলে সুশোভিত এক গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে 'সাতদিন নয়রাত' চলে একেবারে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে হস্তীরাজার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে হাতির দাঁতের তৈরি এক বিশাল রাজপুরী—তাতে হাতির দাঁতের সিংহাসন পাতা। জয়মালাকে নিয়ে হস্তীরাজা সেই সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। দেওয়া মাত্রই হাজারে হাজারে হাতি এসে নূতন রাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে দণ্ডবৎ দিতে থাকে। তারপর হস্তীরাজা নূতন রাণীকে আবার মাথায় তুলে নিয়ে দুইটি বিরাট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে একটি অপরূপ ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়ায়। সেই ঝর্ণার 'সাতধারায় সাতবর্ণের' জল পড়ে। সেই জল তখন সাতটি ঘটে ধরে রাণীর মাথায় ঢালার সঙ্গে সঙ্গেই জয়মালার মনুষ্যদেহ পরিবর্তিত হয়ে এক সুন্দরী হস্তিকন্যার রূপ ধারণ করে। তার মাথার তাম্রকলসটি কপালে ঘটের আকৃতিতে এবং 'সোনার ঝারিটি' সোনালী বর্ণের শুড়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন হস্তীরাজা আবার জয়ধ্বনির মাঝে প্রচার করে ''আজ থেকে আমরা রাণীর আজ্ঞাবাহী মাত্র।' এবং রাণীকে বলে ''তোমার নির্দেশেই আমাদের আজ থেকে গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে।" তারপর রাণীকে পথ - নির্দেশিকা হতে অনুরোধ করায় রাণী তাদের নিয়ে হস্তীর দেশে ফিরে যায়।

প রি চি তি

গল্পের অলৌকিক কাহিনীর অংশগুলিকে বাদ দিলেও, ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও রাণীর কাছে হস্তীরাজার শেষ বশ্যতা স্বীকারের বিবৃতিটি দেখা যায় প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি রেখেই রচিত।

প্রত্যেক দলবদ্ধ বন্য হস্তী মাত্রেই দলের প্রধান হচ্ছে 'রাণী' অর্থাৎ একটি হস্তিনী। সেই সমস্ত দলটির পরিচালিকা। আর দলের মধ্যে 'যূথপতি' যে হস্তীটিকে বলা হয় সে রক্ষক মাত্র। বিভিন্ন - দলবদ্ধ পশুজগতে-র প্রথা অনুযায়ী হাতির দলেরও যূথপতির কাজ — তার সমস্ত 'হারেম'টি যাতে অন্যান্য সাবালক পুরুষ হস্তীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং নিজদের দলের পুরুষ হাতিরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই তাদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর দলের রক্ষক হিসাবে দলের পেছনে থেকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ভুটানের পাদদেশ থেকেই গোয়ালপাড়ার বনবিভাগের সীমানা। তরাইয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এরও গভীর চিরশ্যামল অরণ্যের (ever-greenarea) অংশগুলিই হস্তীযূথের লীলাভূমি।

বর্তমান জগতের এই বৃহত্তম স্থলচর জীবদের ধরে এনে মানুষ কাজে লাগায় এবং এদের ধরার দুঃসাহসিক কাজের ভার গ্রহণ করে এই বেপরোয়া মাহুত, ফান্দি ও তাদের সহকর্মীর দল। যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এদের জীবনের যবনিকা নেমে আসে। চোখের সামনে সহকর্মীর—যার উপর ভরসা রেখে, হাতে হাত মিলিয়ে বনের পথে পা বাড়ায়— হয়তো তারই সমাধিতে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে আসে শঙ্কাকুল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কিন্তু কি এক নেশার ঘোরে আবার সময় হলে নূতন উদ্যমে নূতন জলের হাত ধরে ছুটে যায় আবার ঐ বিপদসঙ্কুল পথে।

তাই বন্যহস্তীদের বশ করার গানের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে তাদের মর্মকথা—

এই মাহুত, ফান্দি ও তাদের সহকর্মীরা কোনো বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত নন। এঁদের মধ্যে স্থানীয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসেন বড়ো, গারো, রাভা — ভুটানের ও নেপালের উপজাতি এবং সমতল অঞ্চলের মুসলমান, রাজবংশী - ক্ষত্রিয়, ও আসামের অন্যান্য জেলার অধিবাসী। এছাড়া বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ থেকেও এসে মিলিত হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক।

সেখানে জঙ্গলের আইনকানুন সাধারণ সামাজিক প্রথা থেকে ভিন্ন। এখানে জাতি বা সম্প্রদায় দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় না। সাহসে ও কৌশলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলে তাঁরাই হন 'গুরু'র আসনের অধিকারী। তাঁরাই দলের 'সর্দার' বা অধিনায়ক। তখন তাঁর নির্দেশ ও চরণধুলি মাথায় নিয়ে অন্য সব কর্মীরা এই সব দুঃসাহসিক কাজে বেরিয়ে পড়ে।

বর্ষার শেষে শরৎকাল থেকেই চলে এই হাতিধরার পরিকল্পনা ও তোড়জোড়। শীতের প্রারম্ভ থেকে সারা শীতকাল পুরোদমে শিকার চলে। আবার গ্রীষ্মের সূচনাতে বন্ধ হয়ে যায় হাতিধরার কাজ।

তখন মনে পড়ে বাড়ির কথা। স্ত্রী-পুত্র প্রিয় - পরিজনের কথা। ফিরে চলে এই দুর্ধর্ষ মানুষগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথে আপন কুটিরের শান্ত স্নেহময় পরিবেশের অভিমুখে।

আবার গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষার মেঘ কেটে যায়— শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখে আবার মাহুত - ফান্দিদের মন নেচে ওঠে। তখন সন্তানের স্নেহ, পিতামাতার ভালবাসা, প্রিয়ার বাহুবন্ধন, ঘরের উত্তেজনাহীন সহজ সরল পরিবেশে মনে ক্লান্তি সঞ্চার করে। এখানে নেই প্রতি মুহূর্তের নব নব উদ্দীপনা, নেই জীবন - মৃত্যুর খেলা। 'মহালদারে'র আহ্বানের আশায় উৎকণ্ঠিত মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

আবার অন্যদিকে শরতের মেঘগর্জনকে নিষ্ফল মনে করা হলেও —মাহুত -প্রিয়ার অন্তরের নিভৃত তন্ত্রীতে সে কিন্তু আঘাত হানে। আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তখন ঐ অঞ্চলের নামহীন কোনো বাহে - কবির রচিত গানের চরণগুলি স্মৃতি পথে ভেসে আসে—

(ওকি ও) ও মোর দান্তাল[১] হাতির মাহুত রে,
যে দিন মাহুত শিখার যায়, নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।
(ওকি ও) ও মোর সারীন[২] হাতির মাহুত রে,
যে দিন মাহুত উজান যায়, নারীর মন পুড়িয়া রয় রে।
আকাশেতে নাই রে চন্দ্র কি করে তোর তারা,
যেবা নারীর সোয়ামি নাই রে, ও তার দিনে অন্ধিহারা।
পুষ্করণীতে নাই রে পানি, নৌকা ক্যামনে চলে,
যেবা নারীর পুরুষ নাই রে, ও তার রূপে কি কাম করে।

(ওকি) ও মোর মাখ্না[৩] হাতির মাহুত রে,
যে দিন মাহুত আসাম যায়, নারীর মন মোর জ্বালিয়া রয় রে।
(ওকি ও) ও মোর টুই[৪] হাতির মাহুত রে,
যে দিন মাহুত জঙ্গল যায়, নারীর মন মোর কান্দয়া রয় রে।

যখন ডাক আসে, তখনি এদের সব বন্ধন নিমেষে খসে যায়। কেউ 'মেলাশিকার' অর্থাৎ পোষা হাতি থেকে পাঁস দিয়ে হাতি ধরতে— কেউ বা 'খেদাশিকার' অর্থাৎ তাড়া করে 'গড়ে' ফেলার কাজে গড়ের অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে।

জী ব ন

'মেলাশিকারে' কিম্বা 'গড়ে ফেলে' যেভাবেই হাতি ধরা হোক, তাদের শিক্ষাপ্রণালীর রূপ একই। বশকরার কালে সদ্যধৃত হাতিরা বশকারীদের ধরার বা মারার যখন চেষ্টা করে, তখন তাকে নিষ্ঠুর হস্তে দমন ও ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দরদী হস্তে আদর দেখানোটাও বশ করার অঙ্গ। সেই সময় গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে এই অঞ্চলে গান করা হয়ে থাকে। তার সংলাপ বা বিষয়বস্তু অবশ্যই হাতির কাছে অর্থহীন। কিন্তু দলবদ্ধ অনেক লোক রোজই যখন বিশিষ্ট একটি সুরে গান করে হাতিটির গায় ঘাস বা খড় দিয়ে ঘসতে থাক, তখন প্রথম কয়েকদিন হাতিদের অস্বস্তি ও ভয়ের উৎপত্তি হলেও পররে তাকেই সহজ ভাবে নিতে শেখে এবং লোকজনের উপর আক্রোশ ও ভয় ক্রমেই কমে আসতে দেখা যায়।

গানের সময় হাতিটির সামনে একজন একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দাঁড়ায় এবং গানের তালে সেই হাতির সামনে দোলাতে থাকে। এই সব গানের মধ্যে কতগুলিতে কিছু কিছু কথা আছে যার স্থানীয় বা অন্য ভাষার সঙ্গে যোগ নেই। কেবল যারা হাতি ধরার বা পাল নকরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এগুলি তাদেরই কথা। যেমন আগের গান —'দান্তাল', 'মাখ্না', 'সরানী', 'টুই' বলে হাতির বিভিন্নতা বোঝান হয়েছে, তেমনি আর এইগানে 'দোহার' কথাটি আসবে। দোহার গানের আসরেই সর্বপরিচিত, কিন্তু এখানে ফান্দির হাতি ধরার সাহায্যকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথমে ফান্দিই হাতিটিকে ফাঁস পরায়, পরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি 'দোহার' অপর পাশ থেকে আর একটি ফাঁস লাগিয়ে দেয়।

প্রথম গান ঈশ্বররের আরাধনা দিয়ে আরম্ভ করাই রীতি। এই গানটি দলের মধ্যে একজন প্রথম একলাই গেয়ে যায়— পরে অন্যরা দল বেঁধে তার পুনরাবৃত্তি করে।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল।
কোন মহালের হাতি রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল?
(অমুক) মহালের হাতি রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল।
কোন বা ফান্দির ধরা রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল।
কোন মাহুতের দোহার রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল?
(অমুক) মাহুতের দোহার রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল।

যে 'মহালের' হাতি বা যে 'ফান্দির' ধরা এবং যে 'মাহুতের দোহার', অমুকের স্থলে সেই নামগুলিই বলা হয়ে থাকে।

এই আল্লাহহ্ রসুল বলার কালে অন্য সম্প্রদায়ের কোনো আপত্তি দেখা দেয় না; বরং সকলেই যেন এটিকে নিয়ম করে মেনে নেয়।

তারপর 'হস্তীকন্যা'র দয়া উদ্রেকের চেষ্টা চলে। যে বন্যহস্তীটিকে শিক্ষা দেওয়া হয় সে মেয়ে বা ছেলে হাতি যাই হোক না কেন— তাকেই 'হস্তীকন্যা'র প্রতীকরূপে ধরে নিয়ে তার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ গানটি করা হয়ে থাকে:

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামুনের নারী,
মাথায় নিয়া তামকলসী, ও সখি হস্তে সোনার ঝারি।
সখিও—ও মোর হায় হস্তীর কন্যা রে—
খানিককো দয়া নাই মাহুতের লাগিয়া রে।
পাত্তিরা[৫] করিয়া কন্যা বাড়েয়া দিলেন পাঁও[৬],
মাথার উপর কাল - জিটি[৭], ও সখি করে পঞ্চরাও[৮]।

(অর্থাৎ দিনক্ষণ দেখে তুমি পা বাড়িয়েছ, যাত্রা করেছ, কিন্তু তোমার মাথার উপর কালরূপী টিক্‌টিকি 'পঞ্চধ্বনি' তুলে অমঙ্গলের সঙ্কেত দিয়েছিল। তাই তোমার এই বিপত্তি— তুমি আজ বন্দিনী হয়েছ।)

তারপর নিজেদের দুঃখের বর্ণনা করে দয়ার উদ্রেক করা হচ্ছে—

বালুটিল্‌টিল্[৯] পঞ্খী কান্দে বালুতে পড়িয়া।
গৌরীপুরিয়া[১০] মাহুত কান্দে, ও সখি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া।
আই ছাড়িলং[১১] ভাই ছাড়িলং, ছাড়িলং ও সখি অল্প বয়সের নারী।

তখন হয়তো বা তার অল্পবয়সের প্রিয়ার মানসিক অবস্থাটি স্মৃতিপথে উদয় হয়। তাই তারই গানের কলিগুলির পুনরাবৃত্তি চলে।

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তোর তারা।
যেবা নারীর সোয়ামি নাই রে ও তার দিনে অন্ধিহারা[১২]।
পুখুরিতে[১৩] নাই রে পানি নৌকা ক্যামনে চলে।
যেটু[১৪] নারীর পুরুষ নাই রে, ও তার রূপে কি কাম করে।
তাররপর তার নিজ কর্ম্মজগতে ফিরে আসে।—
পান্দ্[১৫] লাদিলং[১৬], ফাড়া[১৭] লাদিলং, আরো লাদিলং দড়ি।
মাহুত ফান্দি যুক্তি করি, ও সখি চইললং শিকার বাড়ি।
আগাড়ি[১৮] পিছাড়ি হস্তীর ফেলাইলাং বান্দিয়া।
আর হরিধ্বনি দিয়া সখি, ও সখি বসিলাম ভিড়িয়া[১৯]।

এই গানটিতে বর্তমানে দেখা যায় কিছু ভিন্ন ভাষা প্রবেশ করেছে। তার কারণ গানটি এই অঞ্চলের হলেও হাতি শিক্ষার কালে

অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও এই গানে যোগ দেয়। তাই ‘পুষ্করণী’র স্থলে ‘পুখুরিতে’ কিম্বা ‘যেবা’র বদলে ‘যেটুক’ এই অসমীয়া কথা এতে যেমন দেখতে পাওয়া যাবে, তেমনি ‘আগাপাচা পাঁও হাতি’র স্থলে ‘আগাড়ি, পিছাড়ি’ হিন্দুস্থানীও স্থান করে নিয়েছে।

এইসব পর্ব - শেষে আসে বিশ্রামের কাল। সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর অবকাশ মেলে। কেউ বা গিয়ে গা এলিয়ে দেয় খড়পাতা ছাওয়া কিম্বা ‘ত্রিপাল’ ঢাকা আস্তানায়। কেউ বা সেখানকার জঙ্গলের সেই দুঃসহ শীতের মাঝে, অতি আরমের বিরাট বিরাট আগুনের কুণ্ডগুলি যেখানে গন্‌গন্ করে জ্বলতে থাকে — তাকে ঘিরে বসে আড্ডা জমায়। তার মধ্যে মাঝে মাঝে শুরু হয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যন্ত্রে, বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগহীন ঐকতান।

গোয়ালপাড়ার সমতলভূমির রসিক মাহুত তার সাধের দোতারাটি নিয়ে বসে গিয়ে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মাঝে। ভুলে যায় সারাদিনের ক্লান্তি, ভুলে যায় তাদের দিবসের আসুরিক কার্যকলাপ। দিবসের অসুর হয় রাত্রির রসস্রষ্টা শিল্পী। চোখে তখন স্বপ্ন। হয়তো বা তখন মনের কোনে ভেসে ওঠে, হাতির পিঠে ঘোরার কালে কোনো ছায়াঘেরা কুটিরের কানাচ থেকে উঁকি দিয়ে চেয়ে থাকা একটি মুখ। হয়তো কোনো হাটে বা মাঠে কিম্বা নদীর ঘাটে নবপরিচিতা প্রেমমুগ্ধার আশঙ্কাকুল দুটি করুণ চোখ। তখন দোতারার উল্ট ডাংএর সঙ্গে মনে পড়ে যায় অজানা যুগের অজানা কবির রচিত যেন তারই কল্পলোকের প্রিয়তমার অন্তরের কথাটিকে বলে রাখা গানের পদ। তার সঙ্গে সুর হয়ে সুরে খেলা।

আজি আউলাইলেন[২০]মোহ বান্দা[২১] ময়াল রে।

আজ তুমি আমার বাঁধা ‘ময়াল’ (অর্থাৎ মহাল) বাঁধা ঘরটাকে এলোমেলো করে দিলে :

আজি আউলাইনের মোর বান্দা ময়াল রে।
হাতির পিটিত থাকিয়া রে মাহুত কিসের বাটুল[২২] মারো
ওরে পরের ঐ কামিনীক দেখিয়া জ্বলিয়া ক্যানে মারো রে।।
হাতির পিটিত থাকিয়া র মাহুত থোরর কলা[২৩] ভাঙো।
নারীর মনের কথা তোমরা কিবা জানো।
রাস্তা ছাড়ো রাস্তা রে জলের কলস কাঙ্খে।
মিছা মায়া নাগেযা রে মাহুত পাগল কইরলেন মোকে রে।।
হাতির পিটিত থাকো রে মাহুত হাতির মায়া জানো।
নারীরো বেদনা রে মাহুত কিবা তোমার জানো রে।।
বৈদ্যাশিয়া মাহুত তোমরা রে, তোমার কিসের মায়া।
নারীর মন ভাঙ্গিয়া রে মাহুত যাইবেন ছাড়িয়া রে।।

আবার অনেক গানে প্রশ্ন এবং তার উত্তরও স্থান লাভ করেছে—

কন্যা : আজি গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে।।
হস্তী নড়ান হস্তীরে চরান কেকোয়া[২৪] বাশের তলে,
কি ওরে — কি কাল সর্পে দংশিল মাহুতক করয়া[২৫] যাও বা মোরে রে।
রোজায় ঝাড়ে, শুনিনে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল[২৬] দিয়া,
কি ওরে — মুঞি নারী ঝারিম মাহুতক ক্যাশের আগাল দিয়া রে।।
খাটো খুটো মাহুত রে তোর মুখ চাপ দাড়ি,
কি ওরে — সত্য করিয়া কন রে মাহুত কোন বা দ্যাশে বাড়ি রে।।
মাহুত : হস্তী নড়াই হস্তীরে চরাই হস্তীর পায়ে বেড়ি;
কি ওরে - সত্য করিয়া কইলাম কন্যা গৌরীপুরে বাড়ি রে।।
কন্যা : হস্তী নড়ান হস্তী চরান হস্তীর পায়ে বেড়ি,
কি ওরে — সত্য করিয়া কন রে মাহুত ঘরে কয়জন নারী রে।।
মাহুত : হস্তী নড়াই হস্তীরে চরাই হস্তীর গলায় দড়ি,
কি ওরে — সত্য করিয়া কইহে কন্যা বিয়াও নাহি করি রে।।

এই অঞ্চলের লোকসংগীতে বহুল পরিমাণে দ্ব্যর্থবোধ রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। তাই ওখানকার স্থানীয় ভাষা জানা থাকলেও ওখানকার লোকসাহিত্যের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকে, তা হলে এইসব গানের প্রকৃত অর্থ বা ভাব কোনমতেই বোঝা সম্ভব নয়। এর পরের গানটির একটি অন্তরাতে এইরকম একটি রূপকের সাক্ষাত মিলবে। সেখানে বলা হচ্ছে—

দই খোয়াইলেন[২৭] দুধ খোয়াইলেন রে,
মাহুত না খোয়াইলেন মাটা[২৮]
এবার হাতে[২৯] টুটিয়া[৩০] গেলো রে,
ঐ কি আসা যাওয়ার ঘাটা[৩১] ?

এখানে প্রথম সারির আক্ষরিক অর্থ বোঝা কঠিন নয়। যার অর্থ দাঁড়ায় ‘‘মাহুত, তুমি আমাকে দই, দুধ তো খাওয়ালে কিন্তু মাথা অর্থাৎ ঘোলের তলায় যে সারবস্তুটি থিতিয়ে জমে থাকে সেটি তো খাওয়ালে না।’’ এই কথা দিয়েই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে— ‘‘তোমার ভালবাসার বাহ্যিক চাকচিক্যময় বস্তুটিকেই আমাকে দিলে, কিন্তু ‘মাটা’ রূপে অন্তরের নিভৃতস্থলে যে বস্তুটি থিতিয়ে আছে — সেই বস্তুটিকে তো তুমি দাওনি।’’ তাই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আশঙ্কাকুল হয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে— তা হলে এবার থেকে তোমার আসা যাওয়ার পথটি কি ‘টুটিয়া’ অর্থাৎ ভেঙ্গেই গেল?’’

সাধারণ সহজ কথার মাধ্যমে এই রূপকগুলিই এইসব গানের বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত রূপকটি পরবর্তী এই গানটিতে স্থান পেয়েছে—

কন্যা : গদাধরের পরে পরে রে, ও মোর মাউতে[৩২] চরায় হাতি,
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে—
ও তোর গলায় রসের কাটি[৩৩]।।

ওরে উচা করি বান্দেন[৩৪] ছাপোর রে,
ও মঞ্জি আইসতে যাইতে দেখিম,
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে।।
ও মুঞ্জি জল ভরিতে দেখিম
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে।।
ওরে দই খোয়াইলেন দুধ খোয়াইলেন রে
মাহুত না খোয়াইলেন মাটা
এবার হাতে টুটিয়া গেলো রে—
ঐ কি আসা যাওয়ার ঘাটা।।

মাহুত : আরে না কান্দেন, কান্দেন কন্যা হে,
ভাঙ্গেন রসের গালা,
এবার যদি ঘুরিয়া আইসোং[৩৫] হে,
কন্যা সোনায় বন্দিম[৩৬] গালা
এবার যদি বাউরি[৩৭] আইসোং হে।

এতক্ষণ মাহুত ফান্দিদের জীবনের যে দিকটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম — তার বেদনার ছায়াটিই যেন প্রতিফলিত হয়েছে বেশি। কিন্তু এই দিকটি নিয়েই তাদের জীবন নয়। যেমন তারা মরতেও পিছপা হয় না, তেমনি জীবনটাকে মনটাকে উপভোগ করারও প্রয়াসী। অবসরকালগুলি আসলেও কাটাতে চায় না। কেউ বা তখন তার পোষা হাতিটিকে চরাতে বেরিয়ে পড়ে পথ ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে। অপরিচিত অঞ্চলে কতজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। নিত্য নতুন বন্ধু বা কখনও বান্ধবীরও সন্ধান মেলে। কেউ বা দু-দিন চলে স্মৃতিপটের অন্তরালে, কেউ বা দাগ রেখে যায় অন্তরের নিভৃত স্থলে। গায়ক মাহুত হাতির পিঠেই সাধের দোতারাটি নিয়ে গান গেয়ে ঘোরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আবার কেউ বা তখন নিজেদের আস্তানাতেই গানবাজনার আসর জমিয়ে বসে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে নাচেরও আবির্ভাব ঘটে। দলে কোনো নর্তক ছেলে থাকলে মেয়ে সেজে নাচ শুরু করে। সেই সব আসরে যে সব গান গাওয়া হয়, সব সময় সেগুলির সঙ্গে মাহুত জীবনের হয়তো যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু মাহুত চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ঐ হুল্লোড়ের মধ্যে স্থান পায় বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত। তার মধ্যে স্থানীয় ভাওআইয়া ও দেহতত্ত্বও থাকে, আবার তারই মাঝে মাঝে হাস্যরসের ও নাচেরপ চট্‌কা অর্থাৎ লঘু তালের গানগুলি দিয়ে আসরটিকে আরো জমিয়ে তোলে।

তাই এই বাধাবন্ধন মুক্ত লোকগুলিকে আমরা দেখতে পাই— কখনও কঠোর কর্তব্যরত নিরলস সহকর্মীরূপে, আবার কখনও গানে - গল্পে, হাস্য - পরিহাসে আনন্দমুখর রসিকপ্রবরকে। কখনও বিপদের মুখে দুঃসাহসী বীরকে। আবার কখনও কল্পনাবিলাসী প্রেমিক বা ভাবুক শিল্পীরূপে।

এই যে বৈচিত্র্যময় জীবন— এইটাই তাদের নেশার সামগ্রী। এই নেশা তাদের কাছে অপরিহার্য। এই নেশা বিনা জীবন তাদের অচল। যে নেশায় পা দেয় সে আর ফিরতে পারে না। এই তাদের জীবন।

তাই এদের এই অসাধারণ চরিত্র ও জীবন, সাধারণ চরিত্র ও জীবন, সাধারণের মনে কৌতূহল জাগায়। আবার এই অদ্ভুত রূপটিই কত মুগ্ধমনে সংঘাতের সৃষ্টি করে এবং তারই চিত্র পল্লীকবির সংগীতে রূপায়িত হয়ে ছড়িয়ে যায়— ‘‘আজ আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে।।’’

শ ব্দ টী কা

১।	দাঁতাল পুরুষ হাতি	২।	যে স্ত্রী হাতির সন্তান হয় নি।
৩।	দাঁতবিহীন পুরুষ হাতি	৪।	যে স্ত্রী হাতির সন্তান হয়েছে
৫।	শুভলগ্ন দেখা	৬।	পা
৭।	কালরূপী টিক্‌টিকি	৮।	পঞ্চধ্বনি
৯।	সৈকতবিহারী পক্ষীবিশেষ	১০।	গোরীপুরের
১১।	মা ছাড়িলাম	১২।	আঁধার (কাব্যে)
১৩।	পুকুরেতে	১৪।	যেবা (অসমীয়া কথা)
১৫।	ফাঁদ	১৬।	ওঠালাম (হিন্দির প্রভাব)
১৭।	ফাঁদের ভিন্নরূপ	১৮।	(হিন্দির প্রভাব)
১৯।	চাপিয়া	২০।	এলোমেলা করে দিলো
২১।	বাঁধা মহাল অর্থাৎ ঘর	২২।	গুল্‌তি
২৩।	কলার মোচা ও গাছ	২৪।	জংলি বাঁশ বিঃ
২৫।	বলেক কয়ে	২৬।	ঢেকি শাকের আগা
২৭।	খাওয়ালে	২৮।	ঘোলের নিচে থিতিয়ে থাকা অশে বিহশেষ
২৯।	থেকে, হতে	৩০।	ভেঙ্গে
৩১।	পথ	৩২।	মাহুতে
৩৩।	পুঁথির মালা	৩৪।	ঘুরে আসি
৩৫।	বাঁধিয়ে দেব	৩৬।	বাহুরিয়া বা ফিরে ফিরে আসি।

সংগীত সংসদে উপস্থাপিত আলোচনাকে ভিত্তি করে লিখিত। সংগীতে সহযোগিতা করেছিলেন প্রবীর বড়ুয়া ও কুমকুম বড়ুয়া।

সৌজন্যে : সাহিত্যপত্র, ১৬বর্ষয ১ম সংকলন, বর্ষা, ১৩৭৭। বানান প্রায় অপরিবর্তিত।